প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৩

মূল্য টাকা

আরও একটা ঈষৎ শ্লেষের কণ্ঠ বেজে উঠল - অনিরুদ্ধ বাবু দেখছি ভয়ে নীল হয়ে গেছেন!

অনিরুদ্ধ, প্রত্যুত্তরে শুধু একটু ঠোঁট কামড়ে বলল—না না সমস্ত ব্যপার আমার ভাল লাগছে না, মোটেই ভাল লাগছে না। প্রথমতঃ আমাদের সঙ্গের লাঠিয়াল দুটো ঠিক নৌকায় ওঠার সময় কোথায় গেল তার পাত্তা পাওয়া গেল না। সঙ্গে এত টাকা রয়েছে খাজনার। তাছাড়া মাঝিদের যত তাড়া দিচ্ছি ওদের যেন গা নেই। আর তোমাকেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত দেখছি তারাপদ। ব্যাপার কি?

—ব্যাপার? তারাপদ লঘু স্বরে প্রশ্ন করল "যা ঘটছে ঘটতে দিন, বিপদ যদিই আসে কি করতে পারেন আপনি?"

দৃঢ় কঠিন মুখে অনিরুদ্ধ বলল—দেখা যাক।

তারপদ অনিরুদ্ধদের নূতন গোমস্তা। অল্প কয়েকদিন বাহাল হয়েছে। তার চাল চলন অনিরুদ্ধর মোটেই ভাল লাগছিল না।

নদীর ওপর সন্ধ্যা রক্তিমাভা নিয়ে মিলিয়ে গেল, ধীরে ধীরে রাত্রি দুর্গম কৃষ্ণাভ আস্তরণ পৃথিবীর ওপর টেনে দিতে লাগল, আকাশে জ্বলে উঠল কত তারা আর এক কালো পঞ্চমীর ম্লান চাঁদ। অনিরুদ্ধর বয়স অল্প, সে ভাবছিল বিপদ যদিই আসে একবার বুঝে দেখা যাবে, কব্জীতে কম জোর নেই, তবে বড় একা এই যা।

আর তারাপদরও বয়স অল্প, সে ভাবছিল, অনন্ত কালো আকাশ, বেপরোয়া বিশাল পৃথিবী, কব্জীতে তারই বা জোর কি কম?

স্তব্ধ জগৎ, স্তব্ধ বনানী, কালো রাত আর রূপালী জল। স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে শুধু জলের ছল ছল শব্দে আর মত্ত ঢেউয়ের আঘাতে—যে ঢেউ ক্ষেপে এসে নৌকোর গায়ে বাড়ী খেয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আকাশে অসংখ্য তারা কাঁপছে, জ্বলছে নিভছে, মাঝিরা একদিকে তামাক খাচ্ছে, ঝিমঝিম

করছে রাতের অলস জগৎ। তারাপদর তন্দ্রা এল, কিই বা করবার আছে?

আর অনিরুদ্ধর মাথায় নত ভাবনা এসে তালগোল পাকাতে লাগল। আচ্ছা বাড়ীতে এখন কি হচ্ছে? বাবা নিশ্চিন্ত মনে গড়গড়া টানছেন, মণিকা, তার বোন দুলতে দুলতে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে। আচ্ছা লাঠিয়াল দুটো গেল কোথায়? কেউ কি গুম খুন করল? আর এই নূতন গোমস্তা তারাপদর ভাবগতিক যেন কেমন কেমন, বাবা যে কেন এক সঙ্গে দিলেন কে জানে!

ছৈ এর ভিতর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে অনিরুদ্ধ কত কথাই ভাবছিল কত ছবি ভেসে যাচ্ছিল তার মনে। সে পাশ ফিরল, কতক্ষণ আর একভাবে থাকা যায়? চাঁদের ম্লান আলো ছৈএর ভিতর একটু খানি এসে পড়েছে। পাশ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধর মনে হল, যে তক্তাগুলোর ওপর সে শুয়ে আছে তারি নীচে মাদুরের ফাঁক দিয়ে কি যেন চিক চিক করে উঠল! মাঝিরা তখন পর্দ্দার ওধারে নিশ্চিন্তে তামাক টানছে। অত্যন্ত সাবধানে মাদুরটা সরিয়ে এড়ো কাঠের ফাঁক দিয়ে অনিরুদ্ধ যা দেখল তাতে তার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল।

তারাপদর তন্দ্রা কখন নিদ্রায় পরিণত হয়েছে, নাসিকা তার সুবিধা পেয়ে মৃদু মৃদু গর্জ্জন করছিল। হঠাৎ দেহের ওপর বিশাল একটা ভার অনুভব করে সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতে গিয়ে দেখল তার দুহাত লোহার শীত দুটো হাতে বদ্ধ আর দেহের ওপর বিরাট ভার। অনিরুদ্ধ চেপে বসেছে তার দেহের ওপর।

তাকে চোখ মেলতে দেখেই মৃদু চাপা গলায় অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল—এ সব কি তোমার কীর্ত্তি? তাহলে এই খানেই তোমার শেষ!

অনিরুদ্ধর পাশে একটা খোলা বড় স্কাউট নাইফ ঝক ঝক করছিল।
এইখানে পিছনের ইতিহাস একটু বলা থাক গল্প এগোবার আগে।

বাংলার দক্ষিণতম প্রান্তে কালিন্দীর কোল ঘেঁসে শান্ত স্তব্ধ ধুমচর গ্রামখানা দাঁড়িয়ে আছে। তারও দক্ষিণে আর গ্রাম নেই সেখানে শুধু গাছেদের রাজ্য, বন, বাংলার বিখ্যাত সুন্দর বন। ধুমচরের জমীদার উমেশ বোসের দুটি মাত্র ছেলে মেয়ে, অনিরুদ্ধ আর মণিকা।

জমীদারীর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বন, আর পাশ দিয়ে চলে গেছে খরস্রোতা কালিন্দী। বনের নাম সুন্দর যে দিয়েছিল তার যথেষ্ট সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে বলতে হবে কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এমন আর কোথাও দেখা যায় না; গঙ্গা এখানে শতধারা হয়ে উদ্দাম গতিতে সাগরের পানে ছুটেছে, কালিন্দী তারই একটা প্রশাখা। নদীর গতির স্থিরতা নেই, নিয়তই তার পথ বদলায়। কাজে কাজেই কত চর ভাঙ্গে আর কত পড়ে। নতুন সমস্ত চর গুলি অত্যন্ত উর্ব্বর তাই দুঃসাহসী বাঙ্গালী মুসলমান আর হিন্দু চাড়ালের দল কিছু বেশী শস্য এবং বেশী টাকার লোভে সেই সমস্ত চরে গিয়ে চাষ এবং বসবাস সুরু করে। এই সমস্ত চর উমেশ বাবুর এলাকার অন্তর্গত। এই সব জায়গায় এতদিন খাজনা আদায় করে এসেছেন স্বয়ং উমেশ বাবু কিম্বা তাঁর পুরোণ গোমস্তা।

পুরোণ গোমস্তা কিছুদিন হল গত হয়েছেন আর তারই জায়গায় বাহাল হয়েছে তারাপদ, নতুন গোমস্তা। তারাপদ লোকটা কেমন যেন চাপা, বেপরোয়া ভাব, সংসারে তার কোন আত্মীয় স্বজন আছে কিনা জানা যায় না অথচ কেমন করে সে অল্প কয়েকদিনেই উমেশ বাবুর বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

অনিরুদ্ধ এবারে কলেজে পড়া শেষ করে গাঁয়ে এসে বসেছে। আজ পর্য্যন্ত উমেশ বাবু তার গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগতে দেন নি কিন্তু

বয়সত বাড়ছে, কবে আছেন কবে নেই কে বলতে পারে ? ছেলেকে একটু একটু করে জমীদারীর ভার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আর ঠিক এবারে বালুখালির চরের খাজনা আদায়ের সময়ে উমেশ বাবুর বাত বেড়ে গেল। তাই তিনি অনিরুদ্ধকে ডেকে বললেন—ওরে এবারে বালুখালির চরের খাজনাটা তুই আদায় নিয়ে আয়, সঙ্গে তারাপদ যাবে আর শিবে আর দিনুকে সঙ্গে নিস।

শিবে আর দিনু উমেশ বাবুর পুরোণ লাঠিয়াল।

অনিরুদ্ধ জিগেস করল—তারাপদ কেমন লোক বাবা ? বিশ্বাসী ত ?

—অবিশ্বাসের কোন কাজ এখন পর্য্যন্ত ত করে নি তবে মানুষের মনে কি আছে কে জানে ? তুই বাজিয়ে নে তোকেইত ওদের চালিয়ে চলতে হবে।

আজকাল মাঝে মাঝে এমনি করে উমেশ বাবু তাঁর বয়সের দোহাই পেড়ে থাকেন।

ভাটার জল ছল ছল করে বয়ে চলেছে, কাস্তমুখী মুখর নদী, কূলে বাঁধা নৌকোটো তার ওপর নাচছে। ভোর বেলাই তারা যাত্রা করল কারণ পৌঁছতে প্রায় বেলা চারটে।

ওঠবার সময়ে তারাপদ বলল—আপনি না এলেই পারতেন অনিরুদ্ধ বাবু, আমি একাই সমস্ত গুছিয়ে আসতে পারতাম।

অনিরুদ্ধ তাকে কিছু বলল না, শুধু দিনু আর শিবু লাঠিয়াল দুজনকে বলল—তোরা উঠে বোস।

পথে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটেনি। অনিরুদ্ধ চিন্তিত, আর তারাপদ সমস্ত পথটা উপভোগ করতে করতে গেছে। বালুখালির চরে খাজনা আদায় করে সব শেষ করতে বেলা, পাঁচটা প্রায় বেজে গেল। অনিরুদ্ধ সে দিনটা সেখানে থেকে যাবার পক্ষেই ছিল কিন্তু তারাপদ বলল—কোথায় কোন চরে কার বাড়ী পড়ে থাকবেন অনিরুদ্ধ বাবু ? চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল---আজকেই যাবার এত তাড়া কেন ?

---অচেনা অজানা জায়গা তার ওপর সঙ্গে এত টাকা রয়েছে, রাত বিরেতে এসব চাঁড়াল বাগ্দীদের আড্ডায় পড়ে থাকা কি উচিত ?

অনিরুদ্ধ আর কিছু বলল না। গাঁয়ের প্রজাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তারা আবার নৌকা মুখো অগ্রসর হল।

তারাপদ বলল—দিনু আর শিবে একটু আগে আগে যাক, সব লোককে জানিয়ে আর লাভ কি যে আমাদের সঙ্গে টাকা কড়ি রয়েছে।

দিনু আর শিবু এগিয়ে যাচ্ছিল অনিরুদ্ধ ডেকে বলল---দিনু তোর লাঠিটা দিয়ে যা।

তারাপদ হাসল—ভয় পেয়েছেন অনিরুদ্ধবাবু ?

সমস্ত চরটায় শুধু চাঁড়াল মুসলমানদের বাস। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ক্ষেত। নবীন সবুজ ধান দুধারে বাতাসে কাঁপছে দোলছে দুলছে, তারি মধ্যে দিয়ে আলের পথ এঁকে বেঁকে মোচড়াতে মোচড়াতে চলেছে। পথের একটা বাঁকে কেউ এগিয়ে গেলে পেছন থেকে আর দেখা যায় না। দিনু আর শিবু কখন তেমনি একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশ থেকে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ শেষ ম্লান ক্ষমতা প্রকাশ করছিল। তারাপদ বলল---কেমন সুন্দর দেখছেন এখানকার বিকেল।

অনিরুদ্ধ বলল---বেশ।

নৌকোর কাছে যখন তারা এসে পৌঁছাল, তারা দেখল তাদের নৌকায় কয়েকজন নূতন মুসলমান মাঝি বসে রয়েছে পুরোণ মাঝিরা নেই। আর দিনু আর শিবুর কোথাও কোন পাত্তা নেই।

অনিরুদ্ধ জিগেস করলে---ব্যাপার কি তারাপদ ?

আমতা আমতা করে ঢোক গিলে তারাপদ বলল—তাইত কিছু বুঝতে পারছি না।

মাঝিদের প্রশ্ন করে জানা গেল পুরোণ মাঝিরা আজ আর ধূমচর ফিরবে না, তারা গাঁয়ে গেছে আর বাবুদের পাইকের কথা তারা কিছু জানে না।

এমন অবস্থায় কি করা যায়? অনিরুদ্ধর মনে ক্রমাগতই তারাপদর ওপর সন্দেহ জমে উঠছিল। সে ভেবে পেলনা কি করবে। পেছনে অজানা এক চরে মুসলমানদের আড্ডায় রাত কাটান আর, সামনে তারাপদ

যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তাহলেও বিপদ। তবু নৌকোই ভাল পিছনের ডাকাতের হাতে পড়া কোন সুবিধে নয়।

এমন সময় তারাপদ বলল—চলুন উঠে পড়া যাক, যা কপালে আছে হবে। ভয় পেয়েছেন অনিরুদ্ধ বাবু?

..পশ্চিমের আকাশ তখন লাল হয়ে আসছে, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি ভৈরব কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। অনিরুদ্ধ নৌকায় উঠে মাঝিদের বলল —হাঁকিয়ে চল বাপু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে বকসিস্ পাবে। পীরের নাম নিয়ে মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দিল। এর পরের ঘটনা কারও অজানা নেই।

দুই

বুকের ওপরে অনিরুদ্ধকে দেখে, আর তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে তারাপদ প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে বুঝতে পারল একটা অসাধারণ কিছু ঘটেছে। সে চাপা গলায় বলল—কি হয়েছে অনিরুদ্ধ বাবু কি বলছেন আপনি ?

—আমি জানতে চাচ্ছি, এ সব ষড়যন্ত্র তোমার কি না ?

—ষড়যন্ত্র ? কি বলছেন আপনি ?

এবার তার বিস্মিত কণ্ঠস্বরে অনিরুদ্ধও বিস্মিত হল। আর তারাপদ আবার বলল—কি হয়েছে অনিরুদ্ধ বাবু শিগ্‌গির বলুন, কতক্ষণ আর আমায় এমন করে ধরে রাখবেন ?

অনিরুদ্ধ বলল—আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে ভীষণ, তোমার কথাবার্তায় তোমাকেই আমার ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা বলে মনে হয়েছিল…

এই পর্য্যন্ত বলে অনিরুদ্ধ থামল।

তারাপদ বলল—তাই যদি হয় তাহলেই কি আপনি রক্ষা পাবেন ? আমি একবার চেঁচালেইত আমার সাঙ্গপাঙ্গরা এসে আপনাকে সাবাড় করে ফেলবে, বড় জোর আপনি আমায় মারবেন। কিন্তু তাহলেই কি আপনি রক্ষা পাবেন, না খাজনার টাকা বাঁচবে ? দিন ছেড়ে দিন।

অনিরুদ্ধ তার যুক্তির সার্থকতা বুঝে তাকে ছেড়ে দিল।

—এবারে কি হয়েছে বলুন ত ?

অনিরুদ্ধ মাদুরের ফাঁক দিয়ে নৌকার তলায় দেখিয়ে দিল। ছৈএর একধারে কাপড় দিয়ে পর্দা ফেলা, তার ওদিকে মাঝিরা বসে তামাক টানছে, সে জায়গাটাতেও মাদুর পাতা। এদিকের ফাঁক দিয়ে নৌকোর তলায়

দেখা গেল ঠিক যেখানটাতে মাঝিরা বসে আছে তার নীচে হাত মুখ বাঁধা দুটো লোক পড়ে আছে। আর সেই অল্প চাঁদের আলোয় তারাপদ দেখল কতগুলো রামদা আর বল্লম ঝক ঝক করছে।

--"ব্যাপারত জলের মত পরিষ্কার" তারাপদ বলল "মাঝিদের কারসাজি। ওরাই দিনু আর শিবুকে পথ থেকে সরিয়েছে, তার পরে আর খানিকটা গেলেই জটেবুড়ির বাঁক, সেখানেই বন সব চেয়ে বেশী গভীর। সেখানে আমাদেরও সবাবার মতলব। আচ্ছা দেখা যাক ওরা দলে পাঁচজন আমরা দুজন, হাতিয়ার সবই ওদের হাতের গোড়ায় আর ঠিক ওদের বসবার নীচেই দিনু আর শিবে পড়ে আছে, ওদেরও ছাড়াবার উপায় নেই সাঁতার জানেন অনিরুদ্ধবাবু।

ফিস ফিস করেই কথা চলছিল তেমনি স্বরেই অনিরুদ্ধ বলল—হ্যাঁ।

---তবে দিন আর দেরী করবেন না, আপনার ছুরিটা দিন, আর যেমন শুয়ে ছিলেন তেমনি শুয়ে থাকুন।

তারপরে তারাপদ উপুড় হয়ে শুয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ছুরিটা দিয়ে নৌকোর তলাটা কাটতে সুরু করল। বাঁচবার সেই একমাত্র উপায়।

ওপরে ম্লান চাঁদ মানুষের ক্রূরতা দেখে মলিন হাসছে, ঝক ঝক করছে তারার দল, সুদূর কূলে নিঃশব্দ প্রহরীর মত গাছের দল দাঁড়িয়ে আছে আর কালো অন্ধকারে কালিন্দীর কালোজল পাক খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে।

নৌকোর ভিজে কাঠ ধারাল ক্লাউট ছুরীর কাছে কতক্ষণ? দেখতে দেখতে তলার কাঠ পাতলা হয়ে আসছে আর অজানা বিপদ আর ভয়ে টিপ টিপ করছে অনিরুদ্ধর বুক। এক একটা পল যেন এক একটা যুগ।

কিছুক্ষণ পরে তারাপদ বলল--হয়ে গেছে এবারে তৈরী হয়ে নিন অনিরুদ্ধবাবু।

মালকোঁচা বাঁধতে বাঁধতে অনিরুদ্ধ জবাব দিল---কিন্তু টাকাগুলো?

—আর টাকা, আগেত প্রাণে বাঁচুন। আচ্ছা দেখা যাক বেশী টাকা আছে না নোট?

—নোট।

—তাহলে ফতুয়ার পকেটে নোট গুলো ভরে নিন বাকী জামা টামা ফেলে দিন। ও একমিনিট!

তারাপদ উঠে এসে নিজের কাপড়টা খুলে ফেলে একদিক নিজের কোমরে আর একদিক অনিরুদ্ধর কোমরে বাঁধল তারপরে ছুরী দিয়ে শেষ তক্তাটাতে বেশ বড় করে একটা গর্ত্ত করে দিল। হু হু করে জল উঠতে লাগল তলা দিয়ে।

আর ছুরীটা পকেটে ফেলে সে বলল—নিন এবারে সাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

নদীর জলে ঝপাং করে শব্দ হল আর নৌকো থেকে মহা হৈ হৈ উঠল—সুমুন্দিরা টের পেয়েছে রে, সুমুন্দিরা টের পেয়েছে!

কিন্তু হিংস্র সে চীৎকার বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ করে নৌকোর একদিক জলে ডুবে গেল আর মনুষ্য কণ্ঠের আর্ত্তনাদে নৈশ গগন উঠল পরিপূর্ণ হয়ে।

অনিরুদ্ধ আর তারাপদ তখন মরণের মুখে ভেসে চলেছে। তীব্র খরস্রোতা নদী ভৈরব কল্লোল তুলে পাক খেতে খেতে খরধার সেই স্রোতের মুখে কুটোর মত তারা চলল তীব্রবেগে। বড় বড় ঢেউ এসে চোখে মুখে ভাঙ্গতে লাগল আর সময় বুঝেই যেন পশ্চিম থেকে কালো মেঘ উঠে দেখতে দেখতে সারা আকাশ ফেলল ভরে। সমস্ত প্রকৃতি বিরাট অন্ধকারে ছেয়ে গেল, কূল আর দেখা যায় না। তবু আন্দাজে তারা সাঁতরাতে লাগল, তবে সে ভয়ঙ্কর স্রোতে সাঁতরে পাশ কাটাবার জো কি?

তারাপদ হেঁকে বললে—ভাসিয়ে দিন নিজেকে অনিরুদ্ধ বাবু বেশী

পরিশ্রম করবেন না, স্রোত যতদূর হোক টেনে নিক একটু একটু করে পাশ কাটালেই চলবে।

তারপর চলতে লাগল ঢেউয়ে আর মানুষে যুদ্ধ, তপ্ত ঘন ঘন শ্বাসে জল কেঁপে উঠতে লাগল। জল নোনা বিস্বাদ। সমুদ্র কাছেই কি না!

প্রায় একমাইল ভেসে যাওয়ার পর অনিরুদ্ধর হাতে পায়ে খিল ধরতে সুরু করল। চারিদিকে শুধু সূচিভেদ্য অন্ধকার আর নদী অবিরত ছল ছল খল খল মৃত্যু বাণী শুনিয়ে চলেছে। অতল নদীর তল থেকে মৃত্যু-আঁধারে কার ডাক যেন শোনা যাচ্ছে---চলে এস আমার নরম ঠাণ্ডা বুকে, কোন
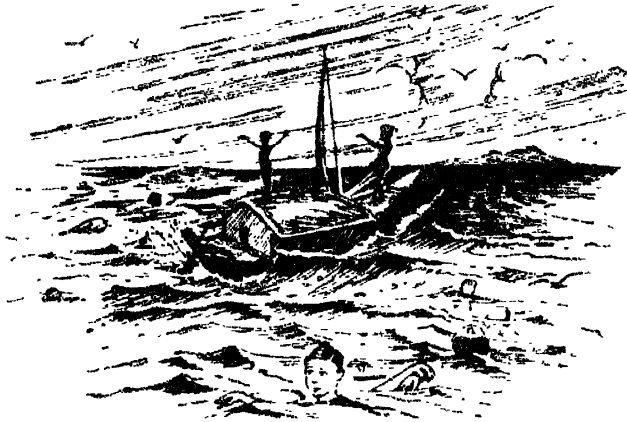
পরিশ্রম নেই, কোন অনুভূতি নেই চেতনা নেই, বিরাট হিমশীতল বিশ্রাম। ঠাণ্ডা সোঁদা মাটির ওপর এসে তোমার দেহ পড়বে মাছেরা খুবলে খুবলে শরীরের মাংস খেয়ে নেবে আর দেহের অস্থিগুলি কোন অবসর মুহূর্তে ভাসতে ভাসতে গিয়ে সাগরের জলে হারিয়ে যাবে। চলে এস।

অনিরুদ্ধর মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, শ্বাস যেন বুক ফেটে বের হতে চায়।

সে হেঁকে বলল—আমি আর পারছি না তারাপদ, তুমি যাও।

—আর একটু সাহস করুন। তারাপদ উৎসাহ দিল।

কিন্তু অনিরুদ্ধর শরীরের ওপর দিয়ে তখন নাচতে নাচতে ঢেউ চলেছে। তারাপদর কোমরের কাপড়ে টান পড়ল। অনিরুদ্ধর ঘোলা চোখের ওপর দিয়েই তখন ঘোলা জল চলেছে আনন্দ কল্লোলে, চোখের সামনে নাচছে অজস্র চলদে তারা। সে তখন হাত পা এলিয়ে দিয়েছে নদীর তলার ঠাণ্ডা মাটি তাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করছে কিন্তু হঠাৎ কিসের একটা আশ্রয় এসে তাকে ওপর দিকে ভাসিয়ে তুলল। অনিরুদ্ধ শেষ একবার চেষ্টা করে চোখ মেলতে গেল কিন্তু সমস্ত অঙ্গ তার অবশ হয়ে গেছে, উত্তেজনা আর অজস্র পরিশ্রমের পর তার চেতনাও আর কাজ করতে চাইল না। অনিরুদ্ধ জ্ঞান হারাল।

তারাপদ সুদক্ষ সাঁতারু, কিন্তু একজনকে পিঠে নিয়ে কতদূর সাঁতার কাটা যায় ? তাছাড়া চারিদিক মসীলিপ্ত, কোথাও কোন দিকে নজর চলে না। এবার সে অনিরুদ্ধকে পিঠে রেখেই সজোরে হাত দিয়ে জল কেটে অগ্রসর হল। কূল দেখা যায় না, অন্ধকারে সব মিশে গেছে, সব একাকার। তবু সে সাহসে ভর করে হাত ফেলতে লাগল। নদীর গতি উত্তর দক্ষিণে। নৌকো থেকে পূর্ব্ব পাড়ই কাছে বোধ হয়েছিল সে প্রাণপণে পূবমুখে হাত চালাল। ঘন ঘন শ্বাসে তার ছাতি ফেটে যাবার মত নদীর আর শেষ নেই। তারাপদর মনেও তখন কালো ভয় উঁকি দিতে লাগল। কোথায় কূল ? আর হঠাৎ সামনে থেকে মৃত্যু যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বোঝা সমেত তারাপদ একটা আওড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। নদীর জল সেখানে ভীষণ বেগে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। সেই আবর্ত্তে পড়ে তারাও পাক খেতে লাগল বেগে, অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল তারাপদর সামনে। সে বুকফাটা এক চীৎকার করে উঠল আর এক মুহূর্ত্ত মুখ তুলে বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে অমানুষিক

শক্তিতে বাহুতাড়না করল। ঘূর্ণমান জল তার শরীরে বাধা পেয়ে তির্য্যক গতিতে বেঁকে গেল। সেই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্ত ছাড়িয়ে সবেগে তারাপদ আবার স্রোতের মুখে নিক্ষিপ্ত হল। এখানে স্রোত যেন ভায়ানক বেশী, তাছাড়া

তারাপদ ধপ করে অনিরুদ্ধকে ফেলল।

শরীরের সমস্ত শক্তি চলে গেছে মাথার মধ্যে দপ দপ করছে, পিঠে প্রকাণ্ড এক বোঝা, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। তারা৷দ অবশ ভাবে হাত ছেড়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার মনে হল কে যেন সজোরে তার

হাঁটুতে প্রচণ্ড এক লাঠির বাড়ী দিল। পায়ের তলায় মাটি। নদীর বেগে মাটির বিরুদ্ধে তারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। নদী সেখানটায় কূলের কাছে বাঁক নিয়ে প্রচণ্ড বেগে চলেছে। প্রথমটায় তারাপদ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তারপর সমস্ত ব্যাপারটা অনুভব করে সে চেঁচিয়ে—ডাঙ্গা ডাঙ্গা!

পিঠের ওপর থেকে অনিরুদ্ধকে জলে ফেলে ক্ষ্যাপার মত সে ঝাঁকুনি দিতে লাগল—বেঁচে গেছি অনিরুদ্ধ বাবু আমরা বেঁচে গেছি।

প্রথম উত্তেজনা প্রশান্ত হলে, কোন রকমে অনিরুদ্ধকে কাঁধে ফেলে সে পাড়ের ওপর উঠে এল। নানা রকম গাছের দল জড়াজড়ি করে অন্ধকারে মিশে গেছে। একটা গাছের তলায় তারাপদ ধপ করে অনিরুদ্ধকে ফেলে তারপরে নিজেকেও তেমনি করেই মাটিতে এলিয়ে দিল, তার শরীরে আর এক ছটাকও শক্তি তখন নেই। ভীষণ পরিশ্রম, ভয়, উত্তেজনা, রক্ষা পাওয়ার ভাবনাহীন শীতলতায় তার চোখ বুজে এল।

অনিরুদ্ধর যখন জ্ঞান হল তখন আকাশের মেঘ কেটে গেছে ঝলমলে তারার দল আবার সেই পরিচিত হাসি হাসছে, চাঁদ পড়েছে পশ্চিমে ঢলে। প্রথমটা চোখ মেলে সে বুঝতে পারল না এ কোথায় কেমন করে সে এল। আজীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত মন তার হঠাৎ গ্রহণ করল না অপরিচিত এই বিস্ময়কর পরিপার্শ্ব। আকাশ ছোঁয়া গাছের দল নিঃশব্দ প্রহরীর মত স্থির দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গভীর গর্জ্জন করতে করতে এক পাশে ভৈরবী কালিন্দী ছুটে চলেছে, সে সাধারণ মাটির ওপর পড়ে আছে, গায়ের জামা কাপড় সমস্ত ভিজে। একটু একটু করে তার চেতনা ফিরে এল, ফিরে এল আগেকার সমস্ত ঘটনা আর নৈরাশ্যে তার মন ভরে উঠল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল—তারাপদ, তারাপদ কোথায় গেল? তারাপদ, সে দেখল মড়ার মত একদিকে পড়ে রয়েছে আর দৃষ্টি যতদূর চলে—বন, বন, ঘন কালো গভীর বন।

পূবে আগমনীর ছোঁয়াচ লেগেছে, ঠাণ্ডা বাতাস ঊষার আগমনী সংবাদ জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বনের ভিতরে রহস্যময় শব্দে অনিরুদ্ধ চমকে উঠে তারাপদকে ঠেলা দিল—তারাপদ তারাপদ !

ধড়মড়িয়ে জেগে তারাপদ বলল--কি ? কি হয়েছে ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল—গ্ র র।

তারাপদ হঠাৎ ফিস ফিস করে বলল—চুপ চুপ শুয়ে পড়ুন একটুও শব্দ করবেন না। ভাগ্যে বাতাস ওদিক থেকে এদিকে বইছে।

কাছেই কোন জানোয়ারের ভীষণ আর্ত্তনাদে নৈশ গগন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তারপরে করুণ করুণতর হতে হতে সে আর্ত্তনাদ বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

—কোন জানোয়ারকে বাঘে নিল, তারাপদ বলল, "কাছে নিশ্চয় কোথাও পরিষ্কার জল আছে।"

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর কেঁপে উঠছে, স্তব্ধ মৃতের মত তারা নদীর কূলে পড়ে। রহস্যময় অন্ধকার পার হয়ে পৃথিবী তখন সূর্য্যের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। পূব আকাশে ধীরে ধীরে রূপালী আলো প্রাত্যুষিক ধূসরতায় ফুটে উঠতে লাগল।

তিন

প্রভাতের আলো।

নদীর পাড় থেকেই বন ঘন হতে ঘনতর হয়ে ভিতরে চলে গেছে। নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিরালা জগৎ। নদীর ধারে পড়ে থাকলেও চলবে না, ওরা উঠল দুজনে।

তারাপদ বললে—আপাততঃ প্রাণে বাঁচা গেছে কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে। সামনে ত বন দেখছি। কতদূর এসে পড়েছি জানি না এখান থেকে আমাদের সোজা বন ভেঙ্গে উত্তর মুখো চলতে হবে। এখন পারবেন কি অনিরুদ্ধ-বাবু? শরীর কেমন লাগছে?

—শরীর একরকম ঠিকই আছে, কিন্তু তোমার ত পরিশ্রম কম হয়নি।

—আমার অনেক সহ্য হয় অনিরুদ্ধ বাবু গরীবের ছেলে! তারাপদ মৃদু হাসল।

অনিরুদ্ধ মুখ নীচু করে বলল—তোমায় আমি অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম তারাপদ, আমায় মাফ কোরো।

"না না", তারাপদ বলল "সেজন্য আমি আপনাকে তারিফ করি। ওরকম অবস্থায় সকলকেই সন্দেহ করতে হয়, আপনি হুঁসিয়ার ছেলে। আসুন আপাততঃ দুটো লাঠি কেটে নেওয়া যাক।

বড় স্কাউট নাইফটা পকেটেই ছিল।

কতদিনের বিশাল বন। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মাথায় নানা রকমের লতায় জড়িয়ে চাঁদোয়া খাটিয়ে রেখেছে, তারি ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের আলো ঢোকে কি ঢোকে না। নীচে কোথাও শ্যাওলায় ঢাকা, কোথাও কতদিনের পুরাণো পাতা পড়ে জমে রয়েছে। তারি মধ্যে দিয়ে দুটি পথভ্রষ্ট মানুষের

পথ চলা সুরু হল। মানুষের পদচিহ্ন এখানে কোনদিন পড়েনি অথবা ক্বচিৎ কখন পড়েছে। আকাশে মাথার ওপর সূর্য্যের তাপ বাড়তে লাগল কিন্তু বনানী শান্ত শীতল।

—কিছু খাদ্য হলে মন্দ হত না, অনিরুদ্ধ বলল।

—চলুন দেখা যাক।

চলতে চলতে একটা দীঘির মত জলাশয়ের পাড়ে তারা পৌঁছাল। জলে নানা রকমের জলজ উদ্ভিদ। একদিকে দেখা গেল অনেক পানিফল ধরে আছে। তারাপদ বলল—আসুন আপাততঃ কিছু পানিফল সঙ্গে নেওয়া যাক, আহার আর পানীয় দুয়েরই কাজ হবে।

—ওগুলো তুলবে কি করে? অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল।

"দেখুন না" বলে তারাপদ বন থেকে একটা লম্বা লতা ছিঁড়ে নিয়ে এল। আর সেটাকে দড়ার মত করে দুদিকে ধরে ছুঁড়ে দিল পানিফলগুলির ওপারে, তারপরে টেনে নিয়ে এসে সেগুলি কোঁচড়ে পুরতে কতক্ষণ?

বন ভেঙ্গে লাঠি দিয়ে পথ সাফ করতে করতে তারা চলল আবার। এখানে ওখানে নানারকম ছোটখাট প্রাণী দেখা যেতে লাগল আর পাখীদেরও রাজত্ব এই বন।

হঠাৎ একপাশে কতগুলো অদ্ভুত প্রাণী দেখে চমকে উঠে অনিরুদ্ধ বলল —দেখ দেখ, ওগুলো কি?

তারাপদ হেসে বলল—ওগুলো গোসাপ, ঠিক ছোট ছোট কুমীরের মত নয়? ওদের চামড়া ভারী দামী। ওই চামড়ার জন্য নিরীহ বেচারীরা শেষ হয়ে যেতে বসেছে।

একটু থেমে তারাপদ আবার বলল—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন অনিরুদ্ধ বাবু বন ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে? এখানে গাছপালা তত ঘন নয় দেখছেন। আমরা কোন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ছি।

সত্যি সত্যিই বন ক্রমশঃ পাৎলা হতে হতে পিছনে পড়ে রইল আর তারা এসে পড়ল মস্ত এক জলার ধারে। দুচোখ যতদূর যায় একদিকে জল কাঁপছে, মাঝে মাঝে কোথাও ছোট ছোট দ্বীপের মত ডাঙ্গা জেগে উঠেছে তাদের পার হয়ে আবার জল। জলের মধ্যে মধ্যে খাগড়ার ঝোপ মাথা তুলে রয়েছে। বোঝা যায় জল গভীর নয় কিন্তু ছড়িয়ে আছে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে। প্রকাণ্ড এক বাদা। জলের ধারে ধারে অসংখ্য শরবন। আর শরবনে রাজ্যের বুনো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। প্রখর সূর্য্যের আলো জলে প্রতি-ফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে শন শন করে জলার ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে দুটো একটা ভাঙ্গা নলখাগড়ার মধ্যে বাতাস ঢুকে ভুতুড়ে একটা সাঁ-সাঁ করে শব্দ উঠে জলার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

তারাপদ বলল—শরবনের মধ্যে থেকে হাঁসের ডিম পাওয়া যাবে আর হাঁস দু একটা মারতে হবে তাহলেই, আজকের মত খাওয়ার ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। বেশী শব্দ করবেন না অনিরুদ্ধ বাবু দাঁড়ান আমি চেষ্টা করে দেখি।

শরবনের গোড়া থেকেই কোথাও জল নেমে গেছে কোথাও বহুদূর বিস্তৃত সমতল কাদা। একদিকে শরবনে কয়েকটা হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছিল তারাপদ তাদের লক্ষ্য করে সজোরে লাঠিটা ছুঁড়ল। দলের ঠিক মধ্যিখানে গিয়ে লাঠিটা পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে ভীত শব্দ করে কয়েকটা হাঁস উড়ে গিয়ে জলে পড়ল। আর দেখা গেল একটা হাঁস সেই শরবনেই লুটিয়ে পড়েছে আর একটা চীৎকার করে আকাশে উঠল সেটাও সজোরে আহত হয়েছিল। সে সঙ্গীদের সঙ্গে গতি ঠিক রাখতে পারল না। টেরচাভাবে তির্য্যকগতিতে উড়ে গিয়ে সেটা কাদার ওপরে পড়ল। তারাপদ উত্তেজিত হয়ে ছুটল সেটাকে ধরবার জন্যে কাদার ওপরে আর পরমুহূর্ত্তেই তার চীৎকার আকাশ ফাটিয়ে উঠল—বাঁচান বাঁচান অনিরুদ্ধ বাবু।

অনিরুদ্ধ শরবনের মরা হাঁসটাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সচকিত হয়ে সভয়ে

সে দেখল কাদার মধ্যে তারাপদ একবুক বসে গেছে আর একটু একটু করে সে নেমে যাচ্ছে। মুখে তার ফুটে উঠেছে আসন্ন সমাধির ভয়ের চিহ্ন।

—শিগগির অনিরুদ্ধ বাবু আমি ক্রমাগত নেমে যাচ্ছি চোরা কাদার মধ্যে। খবরদার এদিকে আসবেন না। বন থেকে শক্ত দেখে একটা লতা ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিন।

অনিরুদ্ধ প্রাণপণে ছুটল। ওদিকে প্রতি মুহূর্তে কর্দ্দমরাশি তারাপদকে গ্রাস করে ফেলছে, পথ যেন আর ফুরোয় না। বনটা যেন হঠাৎ অনেক পেছিয়ে গেছে।

[illegible] নিরুদ্ধ বাবু

বনে ঢুকে অনিরুদ্ধ দেখল শক্ত একটা মোটা লতা কাঁটার মত শক্ত শেকড় শুপুরী গাছের গায়ে লাগিয়ে উঠে গেছে। হংসরাজ লতা। লতার গোড়াটা সে কেটে ফেলল কিন্তু গাছ থেকে ছাড়ান এক ভীষণ ব্যাপার। মরিয়া হয়ে সুপুরী গাছ বেয়ে সে উঠে গেল আর ছুরী দিয়ে প্রত্যেকটা শেকড় কেটে লতাটাকে সে নামিয়ে ফেলল। তারপরে দড়ীর মত গোল করে

সেটাকে নিয়ে সে আবার ছুটল। এতক্ষণ আছে ত? না ধীরে ধীরে পল পল করে সমস্ত দেহটা কাদার নীচে চলে গেছে! অনিরুদ্ধ শিউরে উঠল। সমস্ত মুখ ভরে কাদা, পাগলের মত একটুখানি বাতাস টেনে নিতে গিয়ে মুখের মধ্যে নাকের ভিতর দিয়ে কাদার রাশি ভিতরে ঢুকবে, একবার ঘড় ঘড় করে উঠবে তারপরে কেঁপে উঠবে শরীর, অসম্ভব একটা যাতনা হয়ে দম বন্ধ হয়ে যাবে কর্দ্দম রাশির তলায়। কাদার ওপর বুদ্বুদের মত কয়েকটা ফুট উঠবে শুধু।

মরিয়া হয়ে অনিরুদ্ধ ছুটল। সে যখন এসে পৌঁছাল তারাপদর গলা অবধি ডুবে গেছে প্রাণপণে সে মাথাটা উঁচু করে রেখেছে। আর বুদ্ধি করে একটা হাতও কাদার বাইরে উঁচু করে রেখেছে। অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে বলল—ভয় নেই তারাপদ এসে গেছি।

লতাটা সে ছুঁড়ে দিল। তারাপদর কাছ থেকে সেটা হাত দুয়েক দূরে পড়ল, তারাপদর চোখে ফুটে উঠল কাকুতি, মুখে তার মরণের করাল ছায়া। লতাটা টেনে এনে আবার ছুঁড়ে দিল অনিরুদ্ধ। এবার অনিরুদ্ধর বুকও ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছিল। লতাটা তারাপদর হাতের বিঘৎ খানেক দূরে পড়ল। কাদার মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল, প্রাণপণ শক্তিতে তারাপদ লতাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাদার মধ্যে তলিয়ে গেল। ভয়ে চীৎকার করে অনিরুদ্ধ লতাটায় টান দিয়ে দেখে ভয়ানক ভারী। হৃদ্‌পিণ্ডটা তার যেন লাফিয়ে উঠল, ধীরে ধীরে লতাটা টানতেই তারাপদর দেহ কাদার ওপর উঠে এল। বজ্রমুষ্টিতে সে লতার একটা দিকে চেপে ধরেছে।

মুখ থেকে কাদাগুলি ঝেড়ে ফেলে শক্ত জমিতে বসে তারাপদ হাঁফাচ্ছিল দমটা একটু স্বাভাবিক হলে সে হেসে বলল—আর একটু হলেই হয়েছিল আরকি! খুব সময়ে এসে পড়েছিলেন অনিরুদ্ধ বাবু। যাক

আমি কাদাগুলো ধুয়ে সাফ করি আপনি মরা হাঁসটার গতি করুন। মরণের মুখ থেকে উঠে এসে ক্ষিধেটা যেন চন চনে হয়ে উঠেছে।

মরণের মুখেও তারাপদর শীতল ভাব দেখে অনিরুদ্ধ বিস্মিত না হয়ে পারল না।

মাংস ছাড়িয়ে অনিরুদ্ধ বলল—আগুণ করা যাবে কি করে ?

তারাপদ স্নান করছিল বলল—আমার ফতুয়ার পকেটে দেশলাই আছে, ভুলে গিয়েছিলাম। শিগগির সেটাকে বার করে রোদে দিন।

অনিরুদ্ধ পকেট হাতড়ে দেশলাই কোথাও পেল না। মাথায় হাত দিয়ে ওরা বসে পড়ল।

তারাপদ বলল---হয় নদীর জলে ভেসে গেছে না হয় এই কাদার মধ্যে সেটা সমাধি লাভ করেছে।

উপায় কি ? হঠাৎ তারা দেখল ফতুয়াটাকে কেচে তারাপদ যেখানে রেখেছিল সেই শরবনের মধ্যে একধারে দেশলাইটা পড়ে রয়েছে একটাও কাঠি নষ্ট হয় নি। শুধু ভিজে জুবজুবে। দেশলাইটাকে এনে খর রোদে রাখা হল। জ্বলবে কি না কে জানে ?

স্নান করা হয়ে গেলে পর, উঠে এদিক ওদিক ঘুরে তারাপদ দেখল একদিকে অনেকগুলো নারকেল গাছ রয়েছে। সে চারটি ডাব আর নারকেল পেড়ে আনল। প্রায় আধঘণ্টা পরে দেশলাইটা শুকিয়ে খট খটে হয়ে গেল অনিরুদ্ধ ইতি মধ্যে শুকনো কাঠ আর পাতা অনেক জোগাড় করে ফেলেছে।

প্রথম কাঠিটা জ্বালতে গিয়ে ভেঙ্গে গেল কিন্তু দ্বিতীয়টা আর কোন যন্ত্রণা না দিয়ে জ্বলে উঠল আর দেখতে শুকনো পাতায় আর কাঠের আগুনে হাঁসের মাংস চমৎকার ঝলসাতে লাগল।

—নূন কোথায় পাওয়া যাবে ? অনিরুদ্ধ জিগেস করল।

—নোনা জায়গায় নুনের অভাব ?
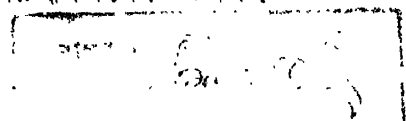
তারাপদ জলার ধারে কাদায় একজায়গায় খানিকটা গর্ত্ত করে রেখে এসেছিল। জল জমে সেটা ভর্ত্তি হয়ে আছে। জলের ময়লা থিতিয়ে পড়ে গেছে সেই জল খানিকটা নারকেল মালা করে সে ফোটাতে লাগল। সমস্ত জলটা ধোঁয়া হয়ে উবে গেলে দেখা গেলে নারকেল মালার গায়ে ময়লা নূন জমে আছে। ক্ষিধের সময় তাই অমৃত। কয়েকটা ডাবের জলে আহার সমাধা হল। তারপরে আবার পথ চলা। যাওয়ার আগে তারাপদ বলল—দাঁড়াও হাঁসের ডিম যতগুলো পাওয়া যায় নিয়ে নেওয়া যাক।

শরবনের মধ্যে খুঁজে প্রায় সাতটা ডিম পাওয়া গেল। রাতটা একেবারে উপোস যাবে না।

সুরু হল আবার পথ চলা, জলা শেষ হয়ে আবার বন সুরু হল। আবার গাছেদের রাজ্য আবার সূর্য্যালোকহীন স্যাঁতসেঁতে জমী, গাছেদের কোলাকুলী, পায়ের নীচের শুকনো পাতার মৃদু মর্ম্মর। কথার বাহুল্য নেই, শ্রান্তিতে শরীর অবসন্ন, বেলা পড়ে আসতে লাগল। থমকান মেঘেরা আকাশ ছোঁয়া গাছের দলের মাথার ওপর রং বদলাতে লাগল, দল বেঁধে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সাদা বকের দল সুদূর দিগন্তের কোন কূলায় পানে ভেসে চলল। সন্ধ্যা নেমে এল বনের ওপর। অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গা দেখে কয়েকটা দেবদারু গাছের তলায় তারাপদ বলল—আজ রাতটা এখানেই কাটান যাবে, কিছু শুকনো কাঠ আর পাতা যোগাড় করা যাক।

জমীটা সেখানে তেকোনা হয়ে একদিকে বাঁধের মত নেমে গেছে। তারাপদ আবার বলল—এই বাঁধের তলা থেকে বুনো জন্তুর তত ভয় নেই আর ও মুখটায় আগুন জ্বালিয়ে রাখলেই একরকম নিশ্চিন্ত। তবে পালা করে জাগতে হবে।

তারপর অন্ধকার রাত ঝিকমিকে মণির মত তারা ভরা কালো আঁচল দিয়ে বনকে ঢেকে ফেলল। দেবদারু তলায় দুটি নিরাশ্রয় মানুষের আগুন

লক লক করে জ্বলে উঠল। সরল দেবদারুর দল আকাশ মাথায় করে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—ডিম কটার কি ব্যবস্থা হবে ? অনিরুদ্ধ জিগেস করল—এদিকে পেট যে জ্বলছে।

—দেখনা

তারাপদ ডিমগুলির ওপর ভিজে মাটি লেপে এক একটা বলের মত করতে লাগল।

—ও কি করছ ? অনিরুদ্ধ বলল

—এই মাটির বলগুলো আগুনে পোড়ালেই ভিতরে ডিমগুলো চমৎকার সেদ্ধ হয়ে যাবে।

তারপর একটু থেমে সে বলল—মনে আছে দিদি এমনি করে কত দিন ডিম সেঁকে দিয়েছে। চুরি করা সম্পত্তি কিনা বাড়ীতে বলবার সাহস হত না। দিদি আর আমি এমনি করেই পাতার আগুন করে ডিম পোড়ানর ব্যবস্থা করতাম।

আকাশ কুচকুচে কালো, বন অগাধ রহস্যময়! সেই প্রস্তর যুগের দুটি আদিম মানুষ যেন পৃথিবীর সেই প্রথম যুগে আগুনের পাশে বসে আছে। কোথাও কোন জীবনের সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই, সামান্য একটু পত্রমর্ম্মর ছাড়া সব ঘুমন্ত মৃতই যেন বা।

—তোমার কে কে আছে তারাপদ ?

তারাপদ তখন আগুনে ডিমগুলি দিচ্ছে, মুখ তার আগুনের আভায় লালচে হয়ে উঠেছে।

—সে কথা আর নাই বা শুনলেন! তারাপদ বলল।

চির রহস্যময় তারার দল ঝলমল করছে, আকাশের গায়ে চিত্রার্পিতের মত পটে আঁকা গাছের দল।

অনিরুদ্ধ বলল—বিপদই মানুষ চেনাবার কষ্টিপাথর তারাপদ, আমি একবার তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম, সেজন্য আমি লজ্জিত কিন্তু তার চেয়েও বেশী আমি চিরকৃতজ্ঞ তোমার কাছে আমার প্রাণের জন্যে। তুমি আমাকে না বাঁচালে এখন আমায় জলের নীচে কুমীরের খাদ্য হতে হোত। তুমি আমায় বন্ধু মনে কর, আমারও কোন বন্ধু নেই! আমরা দুজনেই মানুষ দুজনেই সমান।

তারাপদর দৃঢ় কঠিন মুখ কোমল হয়ে এল বুঝিবা, মুহূর্তের জন্যে চোখের কোণ তার চকচক করে উঠল।

কোন জমীদারের মুখে একথা কোনদিন শুনব আশা করিনি—তারাপদ জবাব দিল—জমীদারেরা ভাবেন তাঁরা ছাড়া মানুষ বুঝি আর মানুষ নয়! সাধারণ প্রজা?—তাদের দেহে লাল তাজা রক্ত বয় না। যাক, আমার ইতিহাস, সামান্য তবে আর কোন লোক আমার মুখ থেকে একথা কখন শোনেনি

আমরা চিরকালই গরীব। মা পাঁচ বছরের দিদিকে আর তিন বছরের আমাকে রেখে চোখ বুজলে, বাবা মনের দুঃখে সোনারপুর ছেড়ে এসে মেহেরপুরে আমাদের নিয়ে ঘর বাঁধলেন। ঠিক সেই সময়ে মেহেরপুরের জমীদারের একজন নায়েব দরকার ছিল বাবা একটু চেষ্টা করতেই সে কাজ হয়ে গেল। অত সহজে কেন যে কাজ হয়ে গেল কে তখন জানত? দিন কতক খুব সুখে স্বচ্ছন্দে কাটল। জমীদার তারাশঙ্কর ছিল দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী জমীদার, দুদিন যেতেই বাবা তা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তখন উপায় কি? প্রজার কান্না, কত স্বামী হারা বিধবার মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, কত অনাথা মায়ের বুকফাটা কান্না কিছুই তারাশঙ্করকে বিচলিত করতে পারত না। এই সময়ে তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াল গাঁয়ের বুড়ো পুরোহিত রামময় ভট্‌চায্যি।

একদিন প্রকাশ্য সেরেস্তায় সে এসে তারাশঙ্করকে বলে গেল—এত অন্যায়ের ফল ভাল হবে না তারাশঙ্কর 'ওপরে একজন ভগবান আছেন।

ঠিক পরদিন রামময় ভট্টচায্যির তলব হল জমীদারী সেরেস্তায়—গত পাঁচ সনের খাজনা বাকী আছে, মিটিয়ে দেবার জন্যে। ভট্টচায্যি বলল—সেকি জমীদার মশাই সব ত আমি মিটিয়ে দিয়েছি।

—মিছে কথা।

—মিছে কথা? বেশ আদালতে প্রমাণ হবে সেটা। -খাজনা দেবে না তুমি?

—দুবার আমি খাজনা দিতে পারি না।

—আচ্ছা দেখি আদায় করতে পারি কিনা।

তারপরে শুরু হল বিপদের সূত্রপাত। আমার বাবার ওপর হুকুম হোল রামময় ভট্টচায্যির বাড়ী ঘরদোর দুপুর রাতে গিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে।

বাবা বললেন—এতবড় অধর্ম্ম কি করে করি জমীদার মশাই?

—পারবে না এতদিন আমার নুন খেয়েছ!

—নুন খেয়েছি বলে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে ত পারি না। আমায় মাফ করবেন।

ব্যস চাকরীত সেই দিনই খতম। ওদিকে যথা সময়েই রামময় ভট্টচায্যির ঘর জ্বলে উঠল। আর আমরা—কুমীরের সাথে ঝগড়া করেত জলে বাস করা চলে না, আমরা ঠিক করলাম গাঁ ছেড়ে যাব।

সেদিনও এমনি একটা কৃষ্ণপক্ষের রাত, আমরা ঘরে তৈরী হয়ে নিচ্ছি বাবা বাইরে গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলছেন। রাতারাতিই সরে পড়তে হবে। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে দিদি আর আমি ছুটে বাইরে এসে দেখি জমী রক্তে লাল আর বাবা মাটিতে লুটোচ্ছে। আমার শিশুমন থেকে সেই বিভীষিকার দৃশ্য মুছে যেতে কত যে সময়ে লেগেছিল তা আর বলা যায় না।

তারাপদ থামল। আগুনের লালচে আভায় দৃঢ় মুখ তার পাথরে কোঁদা মনে হচ্ছিল।

—তারপর ? অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল।

—তারপর আর কি ? গরীবের মা বাপ নেই তবু পশুও একদিন অযথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়ায়। একদিন জমিদার তারাশঙ্কর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিল কোথায়, আর ফিরে আসে নি। রহস্যজনক ভাবে সে পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হল। কেউ আর তাকে দেখেনি। দিদি আর আমি তখন সোনারপুরে চলে এসেছি। তারপরে সে কি অমানুষিক দ্বন্দ্ব। দিদি কোথাও ঝিএর কাজ, কোথাও রাঁধুনির কাজ করে আমায় মানুষ করেছে। বিপদের দোলায় মানুষ হয়ে অল্প বয়সেই আমি অনেক বুঝতে শিখেছিলাম। দিদিকে আমি সাহায্য করতাম সব কাজে। আমার বয়স তখন তেরো, ইতিমধ্যে পাড়ার বামুন মার সাহায্যে দিদির একজায়গায় বিয়ের ঠিক হল। পাত্র স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, কিন্তু এবার অন্তরায় হলাম আমি। দিদি বলল —ওকে ছেড়ে আমার বিয়ে হতে পারে না। ও কোথায় ভেসে যাবে ?

দিদি আমার বেঁকবে না।

তাই একদিন রাতে চুপি চুপি আমি উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম।

খবর পেয়েছিলাম দিদির আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তার কতদিন পরে নিজের পায়ে যখন সম্পূর্ণ ভর করে দাঁড়াতে শিখেছি দিদির শ্বশুরবাড়ী কয়েকদিন গিয়েছি, তার দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে এখন। সুখী হয়েছে দিদি আমার।

আর আমি আগুন, জল বাধা কিছুই মানিনি। কোন কাজই আমার পক্ষে শক্ত ছিল না। যা সয়নি তাকে সইয়ে নিয়েছি, যা নোয়নি প্রাণপণে তাকে নুইয়েছি। আজ এই আমার অবস্থা আর এই আমার ইতিহাস।

নিন ডিমগুলো চমৎকার হয়ে গেছে।

দেবদারুর পাতা আকাশের গায়ে পাতলা ঝালরের মত কাঁপছে। স্তব্ধ মৃত জগৎ। আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলে দিতে দিতে অনিরুদ্ধ বলল—আপনি, করুন, নিন এসব আর নয়। এবার থেকে তুমি, কর, নাও এই সবই চলবে, কি বল তারাপদ ?

—বেশ, তুমি খানিকটা গড়িয়ে নাও এবার, মাঝরাতে তোমায় জাগিয়ে দেব আমি।

চার

ভোরবেলা নিভন্ত আগুন তখনও ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, তারাপদ উঠে দেখল, আগুনের ধারেই কুণ্ডলি পাকিয়ে অনিরুদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছে। সে অনিরুদ্ধকে ঠেলা দিল---ওঠ ওঠ অনিরুদ্ধ।

—উঁ

—উঠে পড়

—উঁ এখন উঠবনা আমি, আগে আমার চা আসুক।

তারাপদ হো হো হেসে উঠল।

—স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি ?

লজ্জিত হয়ে অনিরুদ্ধ উঠে বসল। তাইত কোথায় মমতা ঘেরা আরামদায়ক গৃহ আর কোথায় সুন্দরবনের মাটির বিছানা! বন ওদিকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে অজস্র পাখীর ডাকে। পূবের আকাশে উজ্জ্বল আভা।

---বড় শীত করছে—অনিরুদ্ধ বলল—গায়েত ফতুয়া ছাড়া কিছু নেই।

—চল, চলতে সুরু করলেই শীত কেটে যাবে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে গরম কালেও শীত করে।

লাঠি দুটো হাতে নিয়ে আবার ভেসে পড়ল তারা। বন দুর্ভেদ্য ঘন নয় শুধু লতায় লতায় জালের সৃষ্টি করে পথ বন্ধ করে রেখেছে। লাঠি দিয়ে পথ করতে করতে কিছু দূর গিয়ে নদীর একটা শাখা পাওয়া গেল। সরু নদী কিন্তু তীব্র তার স্রোত। উত্তর দক্ষিণে বয়ে চলেছে। নদীর কূলে কূলে অজস্র পাতা পড়ে পচে আছে, স্যাঁৎসেতে জমী। নদীর কূল ধরে তারা চলতে লাগল, সেখানেই খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা। কিছুদূর চলার পর অনিরুদ্ধ বলল—দেখ দেখ তারাপদ।

গাছের ডালে ডালে অজস্র মর্কট বানর লাফালাফি করছে।

—কিন্তু ওরা অমন করছে কেন? তারাপদ বলল "ওরা যেন কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। দেখছ আরও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠল বানরগুলো। গাছে চড়তে পার অনিরুদ্ধ?

—পারি

—তবে এই আমগাছটায় উঠে পড় শিগ্‌গির, বেশী কথা বার্তা বোলো না।

আমগাছটায় উঠে পড় শিগ্‌গির

আমগাছটায় তারা উঠে পড়ল। কিছুদূর উঠেই দেখা গেল ব্যপার কি!

একটা প্রকাণ্ড বাঘ নিশ্চিন্তে বসে, কোন একটা মরা জানোয়ারের মাংস চিবুচ্ছে।

অনিরুদ্ধ অবাক হয়ে গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল জানোয়ারটার দিকে। এতবড় বাঘ আর কখন সে দেখেনি তাছাড়া কলকাতার চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘ এ নয়। এর স্বচ্ছন্দ রাজকীয় ভাব অনিরুদ্ধকে মুগ্ধ করল।

যতক্ষণ বাঘটা খাওয়া শেষ করে চলে না গেল ততক্ষণ তারা গাছের ওপরেই বসে রইল। তারপরে নেমে নিঃশব্দে চুপি চুপি আবার সেই বনটা ছাড়িয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

গাছের চাঁদোয়া ভেদ করে রোদ এসে পড়েছে স্থানে স্থানে। পথে একটা গাছে কতকগুলি পাকা পেয়ারা পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। পাকা কামরাঙা দেখে অনিরুদ্ধর ভারী লোভ হয়েছিল। তারাপদ বলল—একে শরীরের ওপর এমনি বেশ অত্যাচার চলেছে তার ওপর কামরাঙা খেলে জ্বর হবে।

কাজেই অনিরুদ্ধর কামরাঙা খাওয়া হল না। কিন্তু বঁইচ ফল সে অনেক তুলেছে আর ফলসা পেড়েছে গাছ থেকে ফলসাগুলো বেশ টক আর মিষ্টি।

—উঃ

—কি হল? তারাপদ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল।

—কাঁটা ফুটেছে।

—বার করে ফেল। চোখ না তুলেই তারাপদ বলল। সে এক মনে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ডাণ্ডার মুখ ছুরী দিয়ে ছুঁচল করছিল।

ঝরা আর পচা পাতায় বন ছেয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় ফাঁকা, জায়গায় জায়গায় গাছের অজস্র ভিড়। অনিরুদ্ধ গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলতে চেয়েছিল। তারাপদ বলল—না ফাঁকা দিয়ে চল একটু রোদ লাগলে গলে যাবে না।

পিছনে যেন একটু সামান্য খস্ করে শব্দ হল। তারাপদ চকিত।

—আরও কতদূর।

তারাপদ বলল—ওই গাছগুলো দেখে যেও অনিরুদ্ধ ওগুলো বিছুটি ভয়ানক বিষাক্ত।

অনিরুদ্ধ সরে এল।

— স্‌ স্‌!

—ওকি ? অনিরুদ্ধ চমকে বলল।

—কি জানি ? অনেকক্ষণ থেকে শুনছি। কিছু যেন একটা পেছু নিয়েছে। সাবধানে চল।

তারপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাধা তারা পেল না। মনটা প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে। একটা বিস্তৃত বটগাছের নীচে অনিরুদ্ধ নিজেকে এলিয়ে দিল। তারাপদ ডাব পাওয়া যায় কিনা দেখতে একটুখানি ভেতরের বনে গিয়েছিল হঠাৎ অনিরুদ্ধর চীৎকার তার কাণে এল। ফিরেই সে দেখল অনিরুদ্ধর কয়েক হাত দূরেই একটা প্রকাণ্ড চিতা একেবারে লাফাবার ভঙ্গীতে টান হয়েছে।

তারাপদ একটা অদ্ভুত চীৎকার করে উঠল চিতাটার উদ্দেশ্যে। চিতাটা শিকারে বাধা পেয়ে তারাপদর দিকে চেয়ে একটা গর্জ্জন করে উঠল।

আবার তারাপদ চীৎকার করল।

চিতাটা এবার তেড়ে এল তারাপদর দিকে।

শিকার আর শিকারীর মধ্যে প্রায় দুশো গজ ব্যবধান। চিতাটা ছুটে গেল তারাপদর দিকে বেগে আর তারাপদও তার হাতের ছুঁচল লাঠিটা উঁচিয়ে বাঘটার দিকে তেড়ে চলল। সে জানত বেগই এখন একমাত্র উপায়। পল গোণা যায়। অনিরুদ্ধ চিত্রার্পিত।

যখন বাঘটার আর তারাপদর মধ্যে সামান্য ব্যবধান আর একমুহূর্ত্ত পরেই চিতাটা লাফিয়ে উঠবে, তারাপদ সজোরে বর্শার মত করে লাঠিটা ছুঁড়ল বাঘের মাথা লক্ষ্য করে।

একটা আকাশ ফাটা গর্জ্জন। তারাপদ চোখ বুজল। দুজনের দুদিকের

প্রচণ্ড বেগে লাঠির ছুঁচল মুখটা তখন বাঘটার মাথা ভেদ করে গলা দিয়ে বেরিয়ে মাটিতে গেঁথে গিয়েছে।

আঙুল দিয়ে তারাপদ কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলল। চিতাটার মৃত্যু চীৎকার স্তিমিত হয়ে এসেছে, বনভূমি অকস্মাৎ আবার স্তব্ধ নিস্পন্দ।

অনিরুদ্ধ উঠে এসে তারাপদর পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল—আর একটা ফাঁড়া গেল, আর তারাপদর হাতে মৃদু কৃতজ্ঞ চাপ দিল সে। কথায় আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না।

[illegible]

—বাঘটার মুখে তুমি যখন ছুটে গেলে আমি ভাবলাম এবার শেষ।

—এখানে ভয় পেলে চলে না, ভয় পেলেই শেষ। জানোয়ারগুলোও বুঝতে পারে কখন শিকার ভয় পেয়েছে সেই মুহূর্তেই তারা আক্রমণ করে।

অনিরুদ্ধ বলল—তোমার নার্ভ আছে।

প্রত্যুত্তরে হাসল শুধু তারাপদ।

চিতাটা তখন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। গায়ের জোরে লাঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে তারাপদ বলল—চল আর এখানে নয়।

নদীর শাখার ধার ধরেই তারা এগতে লাগল। জলা আর বনে মিলে সমস্ত আবহাওয়াকে বিষাদময় করে রেখেছে।

—একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি? তারাপদ জিগেস করল।

—কৈ না।

আরও কত পথ চলার পর ক্ষীণ একটা শব্দ তাদের কানে এল—বুম্ বুম।

যত পথ এগোয় শব্দটা বাড়তে লাগল।

—কিসের শব্দ ওটা, একটা কেমন যেন অস্বাভাবিক আওয়াজ। অনিরুদ্ধ বলল থমকে দাঁড়িয়ে

—বুঝতে ত পারছি না, চল দেখা যাক।

কিছুদূর আরও গিয়ে দেখা গেল, নদীটা একটা সুড়ঙ্গের মত অনেকখানি জায়গার ভিতর দিয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের ওপরের মাটি এখনও ধ্বসে পড়েনি। সেই সুড়ঙ্গের মুখে একদিকে জলের স্রোত আর অপর দিক থেকে বাতাসের ধাক্কায় শব্দ উঠছে থেকে থেকে—বুম্ বুম্।

—কত রহস্যই জানে আমাদের পৃথিবী! অনিরুদ্ধ বলল।

সেইদিন অপরাহ্ণে তারা অপেক্ষাকৃত খোলা একটা জায়গায় এসে পড়ল। চারধারে কেবল বাঁশবন আর বাঁশবনের কিছুদূরে থাকতে অনিরুদ্ধ বলে উঠল—দেখ দেখ ওগুলো কি?

বাঁশঝাড়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল অঙ্গারের মত অজস্র কি যেন নড়ছে।

—মজা দেখবে? তারাপদ বলল।

একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে সে সেই বাঁশঝাড় গুলির দিকে ছুঁড়ে মারল আর ক্যাঁ ক্যাঁ করতে করতে আকাশে উঠল হাজার হাজার টিয়া পাখী। সবুজ হয়ে গেল আকাশ।

—বাঁশঝাড়ের সবুজ পাতায় মিশে যায় ওদের শরীর, খালি লাল ঠোঁটগুলি দেখা যায় বলে অমন মজার লাগে।

টিয়ার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই পিছনে খস খস শব্দে তারা চমকে উঠল। ফিরেই দেখে পিছনে গাছের আড়ালে একটা মনুষ্য মূর্ত্তি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে নির্জ্জন বনের মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষ দেখে তাদের বুক কেঁপে উঠেছিল কিন্তু দেখা গেল আর কেউই নয় তাদেরই পাইক দিনু যে তাদের সঙ্গে এসেছিল।

তাদের দেখে দিনু ছুটে এসে, অনিরুদ্ধর হাতদুটো চেপে ধরে বলল—আপনারা বেঁচে আছেন খোকা বাবু? আমি ভাবছিনু এমুখ আর কর্ত্তাবাবুকে কেমন করে দেখাব!

তারাপদ জিগেস করল—ব্যাপার কি দিনু, শিবু কোথায়?

দিনু আঙ্গুল দিয়ে ওপর পানে দেখিয়ে বলল—ওখানে। বালুখালির চরে আপনারা আমাদের এগিয়ে যেতে বললেন। আমরা নৌকোর কাছে আপনাদের অপেক্ষা করছি হঠাৎ মাথায় ভীষণ একটা চোট খেয়ে পড়তে পড়তেই দেখলাম একটা মাঝি দাড় দিয়ে শিবুর মাথায়ও চোট লাগিয়েছে। জ্ঞান যখন হল দেখি নৌকোর তলায় পড়ে আছি হাত পা মুখ বাঁধা আর ঠিক ওপরেই ডাকাতে মাঝির দল বসে তামাক টানছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপার কি তারপরে একটু একটু করে ঘটনা সব মনে পড়তেই প্রথম ভাবনা হল বাবুদের বাঁচাতে হবে। কিন্তু সম্ভব কি করে? ঠিক ওপরেই ব্যাটারা বসে আছে আর আমাদের হাত মুখ বাঁধা। পাশেই দেখলাম রামদা, বল্লম পড়ে আছে। বুঝতে পারছিনা আপনাদের কিছু সর্ব্বনাশ ঘটেছে কিনা। শুয়ে শুয়েই একটা রামদায়ে ঘসে হাতের বাঁধন কেটে ফেললাম। ভাবনু বাঁধা থাকলেত কিছুই হবে না আগে ছাড়া পাওয়া যাক। পায়ের বাঁধন কেটে মুখের বাঁধন খুলতেও বেশী সময় লাগল না।

অন্ধকারেই সব করছি, শিবের গায়ে হাত দিয়ে দেখি হিমের মত ঠাণ্ডা, হাতে চটচটে কি যেন লাগল। কাছে এনে ভাল করে দেখি রক্ত। শিবেকে শেষ করে দিয়েছে বেটারা। ভয় পেয়ে গেনু একবার, বুঝনু যে মরিয়া ডাকাতের দলে পড়েছি। কি করব ভাবতেছি এমন সময়ে কি যেন হয়ে গেল, নৌকা হঠাৎ ভুস করে তলিয়ে গেল। আমি তখন যেন ক্ষেপে গেছি। একটা রামদা হাতে নিয়ে তলার কাঠটা ঠেলে ওপরে উঠে এসে ডুবতে ডুবতেই তিনটে ডাকাতকে কোপ লাগানু। একটার মাথা সাফ উড়ে গেল, একটার হাত আর একটার দুটো পা। নৌকো তখন ডুবে গেছে। বাকী দুটো অন্ধকারে কোথায় জলে ভেসে গেল। আমি সাঁতরাতে সুরু করনু। কি স্রোত বাবা তবে দিনু চাঁড়াল জলকে কোনদিন ভয় খায়নি কিন্তু মনের মধ্যে কি যেন হতে ছিল ভাবনু আর কেন ভগবান? শিবে গেল বাবুরা কোথায় ভেসে গেল কে জানে? এ পোড়া প্রাণ নিয়ে আর কি হবে? তবু সাঁতরে এসে উঠনু কূলে। হরির ইচ্ছে না হলে মরে কে?

তারপর পথ চলতে সুরু করেছি যে দিকে দুচোখ যায়। কাল রাত থেকে আজ সমস্ত সকাল একটা বাঘ পেছনের বনে দৌরাত্মি করেছে তার ভয়ে সারাদিন প্রায় চলতে পারিনি। শেষে বাঘটা শিকার মেরে চলে গেলে আমি পথ চলতে গিয়ে দেখনু আমার আগে এই পথে কে যেন চলে গেছে। লতাপাতা সব ছেঁড়া, রাস্তা করা রয়েছে যেন। প্রথমে ভাবনু সেই দুবেটা ডাকাত তাই সাবধানে পথ চলতেছিনু, মতলব ছিল এবার দেখা পেলে সাবাড় করে দেব বেটাদের। কিন্তু জয় হরি দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে

দিনুর কাহিনী শেষ হলে তারাপদ বলল—সেই ডাকাত দুটোর কি হল কে জানে?

অনিরুদ্ধ জবাব দিল—যাই হোক আর কখন আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া

থেকে ভগবান যেন তাদের বাঁচান। আমাদের সঙ্গে আর দেখা হলে তাদের মরা চোদ্দপুরুষও কেঁদে উঠবে।

কিছুদূর আরও চলার পর একটা দিঘীর ধারে অন্ধকার নেমে এল।

—আচ্ছা এখানে দিঘীর মত এমন পুকুর কোথা থেকে এল? তারাপদ জিগেস করল।

অনিরুদ্ধ বলল—বহুদিন আগে এসব বন ছিল না, এখানে গৌড় বলে বড় এক লোকালয় ছিল। হয় সেই সময়ে কাটা প্রকাণ্ড এক দীঘি যুক্তে আসতে আসতে এই অবস্থায় এসেছে না হয় অন্য কোন স্বাভাবিক উপায়ে নীচু খানিকটা জমির ওপরে জল জমেছে। কে বলবে!

—এখন খাদ্য কিছু পেলে মন্দ হত না।

দিনু বলল—দাঁড়ান দেখা যাক!

একটা সোজা দেখে ছোট একটা বাঁশ কেটে নিয়ে দিনু তার একটা মুখ কেটে ছুঁচোল করে ফেলল। এক হাতে সেইটা আর একহাতে একটা শুকনো কাঠ মশালের মত জ্বালিয়ে নিয়ে দিনু এক কোমর জলে নামল।

নিস্তব্ধ রাত, কোথাও কোন শব্দ নেই, আলো নেই শুধু জলের ওপর সেই জ্বলন্ত কাঠটা স্থির হয়ে আছে। দেখতে দেখতে জলে বুদ্বুদ উঠতে লাগল।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধ আর তারাপদ দেখছে দিনুর পেশীগুলো টান হয়ে গেল। তারপরে হঠাৎ ক্ষিপ্র গতিতে সজোরে সে সেই ছুঁচোল বাঁশটা ছুঁড়ে দিল একটা কিছু লক্ষ্য করে। জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল।

তারাপদ হাততালি দিয়ে উঠল—লেগেছে লেগেছে। খানিকক্ষণ পরে বাঁশে গাঁথা সের চারেক একটা মাছ নিয়ে দিনু উঠে এল।

—এ সব ঠাঁইএতে কেউ মাছ ধরে না, এখানে মাছ মারা খুব সোজা উঠে আসতে আসতে সে বলল।

সমস্ত দিন প্রায় অনাহারের পর পোড়া মাছ তাই অমৃত। তারপরে রাত বাড়ছে আগুন জ্বেলে ওরা পালা করে ঘুমবার ব্যবস্থা করছে হঠাৎ দিনু বলে উঠল—দেখুন দেখুন বাবু বাতী নিয়ে কে যায়।

লাফিয়ে উঠল তারাপদ আর অনিরুদ্ধ। বনের মধ্যে অন্ধকারে বাতী হাতে করে কে যেন চলেছে, আর তাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

তারাপদ হাঁকল—কে যায়? নিস্তব্ধ কালো বনে তার স্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। বাতীটা তেমনিই চলে যেতে লাগল।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে তারাপদ আবার হাঁকল—ওগো আমরা পথ হারিয়েছি আমাদের নিয়ে যাও, সেই হও।

আদিম পৃথিবীর মত নিঃসঙ্গ বনে সে স্বর উচ্চকিত হয়ে মিলিয়ে গেল। বাতীটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল।

তারাপদ আর অনিরুদ্ধ মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কোন শত্রু নাকি?

আবার বনের মধ্যে দূরে আলোটা জ্বলে উঠল।

—কে যায়? এদিকে এস। তারাপদ একটা জ্বলন্ত কাঠ নাড়তে সুরু করে দিল।

আর আলোটা হঠাৎ উঁচুতে উঠতে সুরু করল। প্রথমে মনে হয়েছিল একজন মানুষ লণ্ঠন হাতে করে চলেছে, সে কি হাত উঁচু করে লণ্ঠন দোলাচ্ছে? কিন্তু না আলোটা আরও উঁচুতে উঠতে সুরু করল ক্রমে ক্রমে দু মানুষ ছাড়িয়ে গেল তারপরে গাছের মাথায়।

দিনু সভয়ে প্রণাম করতে করতে বলে উঠল—অপদেবতা! দোহাই ঠাকুর আজকের রাতটা বাঁচিয়ে দাও। দিনু মাটিতে মাথা ঠুকতে সুরু করল।

গাছের মাথা ছাড়িয়ে আলোটা আর একটু উঠে দপ করে নিভে গেল।

অনিরুদ্ধ হঠাৎ হাসতে সুরু করল হো হো করে—আরে আলেয়া, আলেয়া, মার্শ গ্যাস। জলা জায়গায় লতাপাতা পচে একরকম গ্যাস হয় সে গুলো এত বেশী দাহ্য যে সামান্য গরমেই জ্বলে ওঠে। ওটাও তাই। কলেজে ল্যাবরেটরীতে আমরা গ্যাস কত তৈরী করেছি। হা হা কি ভুল!

তারাপদ ও ব্যাপারটা বুঝে হাসতে সুরু করল।

দিনু বলল—ও সব আমি বুঝিনা। তেনারা রাতে কত মূর্তি ধরেন আমি ঠাকুরের নাম করতেই মিলিয়ে গেলেন।

—তেনারা কারা দিনু? অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করল।

গলার স্বর নামিয়ে চুপি চুপি দিনু বলল—ওই যে বলনু অপদেবতা, রাতের বেলায় কি নাম করতে আছে বাবু?

পাঁচ

দিনের পর রাত্রি আর রাতের পর দিন, লোকালয় বহির্ভূত মানুষ তিনটির জীবনের এই সম্বল এখন। দিনে পথ চলা রাত্রে বিশ্রাম। ক্রমশই ভাল খাদ্যের অভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বলক্ষয় হয়ে আসতে লাগল। বনের আর শেষ নেই ধাঁধার মত কখনও সহজ হাল্কা, কখনও দুর্ভেদ্য ঘন হয়ে উঠতে লাগল। সেদিন তারা চলেছে গহন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। বনে অজস্র বানরের বাস। দু একটা চকিত ছোট হরিণও দেখা গেল। বেলা পড়ে আসছে। দীর্ঘ গাছের মাথায় বকের ছানার বিষণ্ণ ম্লান ডাক, দু একটা ঘুঘুর ক্লান্ত করুণ স্বর, অস্তায়মান সূর্য্যের বিষণ্ণ রক্তিমাভা। বনের মধ্যে দিয়ে সাবধানে পথ করতে করতে তারা চলতে লাগল। অবসন্ন ক্লান্ত শরীর, ক্ষত বিক্ষত হস্ত পদ। বনের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য যেন তাদের গ্রাস করবে।

লাঠি দিয়ে পথ সাফ করে যেতে যেতে তারাপদর যেন মনে হল অত্যন্ত সাবধানে কে যেন তাদের অনুসরণ করছে। আশপাশে ঝোপ ঝাড়। এক মুহূর্ত সে থেমে দাঁড়াল। না কোথাও কোন শব্দ নেই! আবার এগিয়ে চলা। কিন্তু না কে যেন তাদের অনুসরণ করছে। তারাপদ কি একটা অজানা বিপদ অনুভব করল আর ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে এক ঝলক বাতাস এল।

তারাপদ বলল—শিগগির, অনিরুদ্ধ দিনু একটা গাছে উঠে পড় দেরী কোরোনা। শিগগির!

বনের পথে তারাপদকেই সকলে অভিজ্ঞ চালক বলে মেনে নিয়েছিল। তারাপদ আর দিনু একটা গাছে উঠে পড়ল আর পাশের আমগাছটায় উঠতে উঠতেই অনিরুদ্ধ শুনল একটা ভীষণ হুঙ্কার।

দিনু চেঁচিয়ে উঠল—খোকাবাবু সাবধান বাঘ বাঘ!

অনিরুদ্ধ বাঘের মুখ পার হয়েই গিয়েছিল কিন্তু সামনের ডালটায় হাত দিতেই ফোঁস করে গর্জ্জন হল।

খোকাবাবু সাবধান বাঘ বাঘ।

অনিরুদ্ধ চীৎকার করে উঠল—সাপ সাপ!

সমস্ত শরীরটা তার ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, সে ডালটা ছেড়ে দিল। কয়েকটা নিমেষ। সেই নিমেষ কটার মধ্যেই সে শুনল তারাপদর ভীত

চীৎকার আর পড়ার মধ্যেই সে দেখল কালো মত একটা কি যেন তার আর বাঘটার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

একটা ভীষণ হুঙ্কার, একটা মৃত্যু কাতর আর্তনাদ, একটা ভীত চীৎকার আর উঁচু ডাল থেকে পড়া। অনিরুদ্ধর মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে গেল। অনিরুদ্ধ জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান যখন হল তখন সে দেখল তারাপদ তার মাথায় জল দিচ্ছে। একটু পরেই ধড়মড় করে অনিরুদ্ধ উঠে বসল।

-- দিকু ? দিকু কোথায় ?

তারাপদ চুপ, নির্ব্বাক।

হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন অনিরুদ্ধ।

--আমি মারব এখনি মারব বাঘটাকে।

অনিরুদ্ধ উঠে লাঠিটা নিয়ে দৌড়োতে গেল। তারাপদ তাকে ধরে ফেলল।

-- চুপ কর চুপ কর অনিরুদ্ধ। তুমি সুন্দর বনের বাঘের সঙ্গে খালি হাতে কিছুই করতে পারবে না। বস, বসে পড়।

আর অনিরুদ্ধ বসে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—নৌকোয় যখন দুজনকে বাঁধা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, তখনও দুঃখ হয়নি। নৌকো ডুবিয়েও দিয়েছি নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে আর আজ সে আমার জন্যে প্রাণ দিল।

সন্ধ্যার পরের ধূসর অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে।

পরদিন আবার দুটি অবসন্ন মানুষের পথ চলা। সেই গহন ভয়ানক বন তারা পার হয়ে এল। এখন থেকে বন অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। গাছেরা এখানে জড়াজড়ি করে নেই, স্বাধীন নির্ব্বিকার ভাবে আকাশে মাথা তুলে দিয়েছে কিন্তু ঝোপ লতা পাতার অন্ত নেই আর ওই ঝোপ ঝাড়ে কোথায় কোন অদৃশ্য বিপদ অপেক্ষা করে আছে কে জানে।

ক্লান্তভাবে দুজনেই পা চালিয়ে চলেছে কথার বাহুল্য নেই। পথ চলা এখন কলের মত। যেতে হবে তাই যাওয়া। অনিরুদ্ধর মনে হল যে এ চলার আর শেষ নেই, বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন সব স্বপ্ন। পথ চলতে চলতে দিনুর মতই কোন এক বিপদে তাদেরও শেষ। মৃত্যু যে কোন আকৃতিতে এসে তাদের গ্রাস করবে। আশা ভরসাহীন অনিরুদ্ধ কলের মত পা ফেলে চলতে লাগল।

তারাপদ কিন্তু তখনও আশা হারায় নি। সে ভাবছিল এমন কত ঝঞ্ঝা কত ঝড় আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ হতাশ হবার কি আছে? মেঘে সূর্যকে ঢেকে ফেললেও সূর্য কি কখনও আর দেখা দেয় না? প্রত্যেক কালো মেঘের ধারেই একটা রূপোলি আশার রেখা আছে। যারা গেল, যারা শেষ হয়ে গেল তারা বদল করল জীবন আবার তারা আসবে। একদিন মরতে হবে বলেই কাপুরুষের মত বসে থাকলে তো জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গেল, মরণকেও জয় করা গেল না। যতদিন বাঁচতে হবে মরণের সাথে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিতে হবে জীবনের সুখের শান্তির উপাদান তারপরে যেতে হয় একদিন হাসি মুখেই মিলিয়ে যাব।

অনিরুদ্ধ বলল—আর যে পারিনা তারাপদ।

—আর একটু, অমন আশা হারিও না অনিরুদ্ধ! আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছোব ধূমচরে।

—আর ধূমচর!

বেলা বাড়তে লাগল। খাদ্যের কিছু জোগাড় নেই, অনিরুদ্ধর উৎসাহ-হীনতা, ক্লান্তি তার ক্ষুধাকে তাড়িয়ে দিয়েছে যেন। বন আবার ঘন হয়ে উঠেছে, আবার সাবধানে পথ করে যেতে হচ্ছে।

একটা গাছতলার বসে পড়ে অনিরুদ্ধ বললে—আজ আর পারব না তারাপদ একটু জিরিয়ে নিতে দাও।

—আচ্ছা তুমি বস আমি কিছু ফলটলের জোগাড় দেখি।

অনিরুদ্ধ বসল আর তন্দ্রাতে তার চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। অনভ্যস্ত শরীর এত ক্লান্তি আর বইতে পারে না। আর সেই তন্দ্রাতেই তার মনে হল যেন সাপের মত লক লক করে এসে গাছের সব শিকড় তাকে জড়িয়ে ধরছে তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে মাটির নীচে তারপরে তার গলিত শরীরটা থেকে টেনে নেবে তাদের জীবনের রস। চারিদিকে গাছের দল একটুখানি হেসে বিশ্রী শ্লেষের হাসি হেসে উঠল যেন—হাঃ হাঃ হাঃ আমাদের রাজ্যে এসে বেঁচে ফিরে যেতে চাও? মরণের দেশে জীবন?

অনিরুদ্ধর হঠাৎ মনে হল না সে এমন করে মরবে না সে যুদ্ধ করবে। প্রাণপণে যুঝবে সে, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তন্দ্রার মধ্যেই তার আশা ফিরে আসতে লাগল জীবনের। আর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ মেলে সে দেখে তারাপদ তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে চোখে মুখে তার অস্বাভাবিক উত্তেজনা ওই শোন!

· কি?

—কিছু শুনতে পাচ্ছনা?

অনিরুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষীণ একটা কোলাহলের আওয়াজ।

—হ্যা হ্যা! অনিরুদ্ধ লাফিয়ে উঠল—কিন্তু কি?

—যা ভাবছি বোধ হয় তাই। কেউ বোধ হয় শিকারে এসেছে। আর গোলমালটা কেনেস্তারা ঢোল ইত্যাদি পেটার শব্দ।

—ও বিটারদের।

তাদের জীবনে যেন নতুন বল এল।

অনিরুদ্ধ বলল—চল।

তারাপদ কোন কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। ছুটল তারা শব্দ লক্ষ্য করে। শব্দ ক্রমে বড় হতে লাগল! ক্রমে আরও বড় আরও বড় তারপরে

মানুষের চলাফেরার রূপ দেখা গেল। মানুষ! মানুষ! আবার লোকালয়! জীবনের আশা! তারা স্বপ্ন দেখছে নাকি? কানে তাদের নানারকম বিস্মিত মনুষ্যকণ্ঠ ভেসে এল যে বোধহয় তাদের সেই [illegible] পোষাক আর খোলা

মূর্ত্তি দেখে। কতগুলো বিস্মিত চোখের সামনে তারা হাঁফাতে হাঁফাতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্যাম্পে বসে সমস্ত শুনে শিকারী মিষ্টার ব্রাউন বললেন—আপনাদের জীবন বাঁচাবার কারণ হতে পেরেছি ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। ক্যানিং এখান থেকে কাছেই সেখানে গেলেই নিশ্চয় আপনারা আপনাদের জমিদারীতে যেতে পারবেন। কাল আমি ফিরব আমার সঙ্গেই যাবেন আপনারা। ইতি মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিন।

অনিরুদ্ধ বলল—অনেক ধন্যবাদ মিষ্টার ব্রাউন।

ক্যাম্পের টুলে বসে অনিরুদ্ধ ভাবছিল দুঃখের অবসান, আবার ধুমচন আবার আত্মীয় স্বজন, স্নেহ মমতা ভালবাসা।

আর তারাপদ স্তব্দ মুখে সুদূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে ছিল।

শেষ।